ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 310- 315
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.212

বন্ধুত্বের নিরন্তর বন্ধন: রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ

সন্দীপ ঘোষ, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the novel Chaturanga, friendship is not merely a matter of personal feeling; it is the driving force behind the structure of the story, the development of the characters, and the progression of ideological conflict. The relationship between Sachish and Sribilash is the central axis of the novel—where friendship rests on mutual trust, sincerity, and the ability to withstand the tests of time. Despite sharp differences in their worldviews, habits, and even social positions, their bond does not break; rather, these very differences make the relationship more complex and profound.

Sachish's spiritual inclination, philosophical temperament, and detachment from society stand in contrast to Sribilash's practical thinking, social entanglements, and personal emotions. This opposition between the two creates a dynamic tension within the novel. Yet, that tension never shakes the foundation of their relationship; instead, it guides their decisions, transformations, and self-reflection.

The research paper suggests that human bonds are more lasting and effective than ideology, religious thought, or political philosophy. Thus, to understand the narrative of Chaturanga, friendship itself becomes the key—binding together the novel's philosophy, conflicts, and character evolution into a single thread.

Keywords: Friendship Dynamics, Narrative Structure, Human Relationships, Character Development, Ideological Conflict

'বন্ধু' শব্দটি সাধারণত 'সখা', 'মিত্র', 'সুহৃদ ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'বন্ধু' শব্দটি মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের প্রতীক। এটি এমন একটি সম্পর্ক, যা রক্তের বন্ধনে গাঁথা না হলেও হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে গড়ে ওঠে। সমাজে মাতা, পিতা কিংবা ভাই-বোনের সম্পর্ক জন্মসূত্রে নির্ধারিত হলেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে জীবন পরিক্রমায়, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও হৃদয়ের সংযোগের মাধ্যমে। এ সম্পর্কের মধ্যে কোনো জৈবিক বা রক্তগত বাঁধন নেই, তবে মানসিক ও আবেগিক স্তরে এটি অত্যন্ত দৃঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ জন্মলগ্ন থেকে রক্তসম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে— মাতা, পিতা, ভাই, বোন ইত্যাদি সম্পর্ক স্বাভাবিক ও পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু বন্ধুত্ব একটি অর্জিত সম্পর্ক। কোনো শিশুর জন্মের সাথে সাথে তার বন্ধু তৈরি হয় না। বরং শৈশব, কৈশোর বা তার পরবর্তী সময়ে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষদের সঙ্গে মনের মিল, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহানুভূতির ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাই এই সম্পর্কের মৌলিক ভিত্তি হলো হৃদয়গত মিল ও আস্থা। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বন্ধুত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমলিঙ্গের মধ্যে বেশি গড়ে ওঠে। অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে পুরুষ কিংবা

নারীর সঙ্গে নারীর বন্ধুত্ব সমাজে অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়। নারী-পুরুষের মধ্যেও গভীর ও সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তবে সাহিত্যে তার নিদর্শন খুবই কম।

মানবসমাজে সম্পর্কের গুরুত্ব কোনো সাম্প্রতিক বাস্তবতা নয়; প্রাচীনকাল থেকেই এটি মানুষের সামাজিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে এসেছে। ইতিহাসের প্রাচীন পর্বে আমরা দেখি, আদিম মানুষ ছিল বনবাসী, তাদের জীবনযাপন ছিল মূলত ফলমূল সংগ্রহনির্ভর। ভয় ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। প্রকৃতির রহস্যময় শক্তি, ভয়ঙ্কর জন্তুর আক্রমণ কিংবা অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের মনে সৃষ্টি করত আতঙ্কের ছায়া। বাঁচার স্বাভাবিক তাগিদ থেকেই তারা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে, একা থাকা বিপজ্জনক; নিরাপত্তার জন্য দরকার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই হিংস্র জন্তু কিংবা প্রাকৃতিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে শুরু হয় দলবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্টা। এই উদ্যোগই মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম একত্র থাকা বা বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন করে। বেঁচে থাকার স্বার্থে গড়ে ওঠা এই প্রাচীন মৈত্রী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-অগ্রগতির ধারা বেয়ে নানা নতুন রূপ ধারণ করে। যখন মানুষ বন্য পরিবেশ থেকে ক্রমে উন্নত জীবনযাত্রার পথে পা বাড়ায়, তখন এই সম্পর্ক শুধু নিরাপত্তার জন্য নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

বাস্তব জীবনে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে এই সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের সবার জীবনেই অন্তত একজন বন্ধু বা সখা থাকে, আর এই 'বন্ধু' শব্দটির সঙ্গে আমাদের আবেগের যোগ গভীর। যেমন বাস্তব জীবনে বন্ধুত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, তেমনি সাহিত্যেও এই সম্পর্কের উপস্থিতি চিরন্তন সত্য হয়ে রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যায় লেখকেরা এই সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি তারা বন্ধুত্বের আবেগ, বাস্তবতা এবং মানবিকতা— সবকিছুকেই শিল্পিত রূপ দিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাবকাল থেকেই বন্ধুত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে পুরুষ বন্ধুত্বকে বেশি চিত্রিত করা হয়েছে। দুই নারীর মধ্যে বন্ধুত্বের চিত্র তুলনামূলকভাবে কম, আর পুরুষ-নারীর বন্ধুত্বও খুব বেশি দেখা যায়নি। তবে পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব বাংলা উপন্যাসে বেশি দেখা যায়। উনিশ শতকের স্বর্ণকুমারী দেবী, রাজকৃষ্ণ রায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধানাথ মিত্র, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের উপন্যাসে বন্ধুত্বের প্রাথমিক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় বন্ধুত্বের বহুমাত্রিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

আমার আলোচ্য বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বন্ধুত্ব। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনের বন্ধু সংসর্গকেও সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। আত্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের জগৎ ছিল বিস্তৃত। 'নর্মাল স্কুলে' পড়াকালীন তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্র, হরিশচন্দ্র হালদার প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সখ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। 'রবিজীবনী' থেকে জানা যায় অক্ষয়কুমার মৈত্র তাঁকে ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহ শিখিয়েছিলেন। সেখানে হরিশচন্দ্র হালদারের কথা পাই। তাছাড়া প্রবোধচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথাও পাই। স্কুল-জীবনে তিনি লোকেন্দ্র পালিতের মতো অন্তরঙ্গ সুহৃদও পেয়েছিলেন। তাছাড়াও প্রিয়নাথ সেন, সতীশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, জগদীশচন্দ্র বোস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশীয় বন্ধু হিসেবে তাঁর জীবনে উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি উইলিয়াম রোটেনস্টাইন, উইলিয়াম পিয়র্সন, এডওয়ার্ড টমসন, ওকাকুরা, প্রমুখ বিদেশী বন্ধুরাও তাঁর সখ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের যেমন অনেক বন্ধুর সংসর্গ তিনি পেয়েছেন একইভাবে সাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসে তিনি বন্ধু বা বন্ধুত্ব সম্পর্কটির রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন।

'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' থেকে শুরু করে যদি আমরা তার শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত দেখি, তবে দেখা যাবে তাতে বিষয় ও বিভিন্ন সম্পর্কের বৈচিত্র্যের সমাহার। সেখানে তিনি বারবার বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিলেন সচেতন মন নিয়েই। তাঁর উপন্যাসে বন্ধুদের মধ্যে স্বভাবগত বা প্রকৃতিগত বৈপরীত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু বৈপরীত্যের মাঝেই তাদের সম্পর্কের ক্রমবিস্তার। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে বন্ধুদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে সম্পর্কের বীজটিকে যথার্থভাবে পরিশীলিত করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নায়ক এবং সহনায়ক পরস্পর বন্ধু। তিনি সম্পর্কটিকে কাহিনিতে বেশি জায়গা করে দিয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা প্রভৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ

করার অবকাশ পাওয়া যায়। গৌণ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এটা সম্ভব হত না। নায়ক এবং সহনায়কদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ আসলে দুটি উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে চেয়েছিলেন, এক সম্পর্কটির পরিপূর্ণ বিস্তারসাধন আর দুই, নায়ক এবং সহনায়কের মধ্যে চিন্তাগত বা আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা করা। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে যা স্পষ্ট লক্ষ করা গেছে।

বিষয় বা পাত্র-পাত্রীর চিন্তাধারা এবং আত্মকথন রীতির সাহায্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পূর্বের উপন্যাসের তুলনায় অনেকটা আলাদা করে ১৯১৫ সালে রচনা করেছেন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। উপন্যাসে দেখা গেছে শচীশ, শ্রীবিলাস এবং দামিনীর মধ্যে প্রেম আর বন্ধুত্বের প্রাধান্য। অবশ্য শুরুতেই আর একটি সম্পর্কের প্রাবল্য আছে তা হল স্নেহ-বাৎসল্যের সম্পর্ক। যা গড়ে উঠেছে শচীশ ও তার জ্যাঠামশায় জগমোহন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ উপন্যাসে নায়ক শচীশের জীবনে ঘুরেফিরে বিভিন্ন সম্পর্কের প্রবেশ ঘটেছে।

তার পারিবারিক তথা আত্মিক সম্পর্ক তার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। আবার শ্রীবিলাসের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং দামিনীর প্রতি টান প্রভৃতি নানা সামাজিক সম্পর্কে বাঁধা তার জীবন। শেষ মুহূর্তে দুই বন্ধু শচীশ ও শ্রীবিলাসের মাঝে দামিনীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসকে সাজিয়েছেন।

এখানে বন্ধুত্বের নিঃশর্ত ভালোবাসা, বির্তক, মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোনো কিছুই বাদ নেই। উপন্যাসে শচীশ এবং শ্রীবিলাসের বন্ধুত্ব এসেছে কলেজ জীবন থেকে। কলেজ জীবন থেকে শুরু হয়ে তাদের বন্ধুত্ব বিভিন্ন টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষদিন পর্যন্ত বজায় থেকেছে। কাহিনিতে শচীশ এবং শ্রীবিলাসের বয়স প্রায় সমান। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শচীশ ও শ্রীবিলাসের বন্ধুত্বের কাহিনি বর্ণনা করলেও, সেখানে শচীশের পারিবারিক জীবনের পরিচয় আছে, শ্রীবিলাসের পারিবারিক জীবনের পরিচয় নেই। এটা রবীন্দ্র-উপন্যাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ সহনায়কদের বংশ-পরিচয়কে তুলে ধরেন না। তবে বন্ধুত্বের সম্পর্কটিকে চালিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাহায্য নেন সহনায়কদের। চতুরঙ্গেও দেখা গেছে একই দৃশ্য। সেখানে কাহিনির নায়ক শচীশ একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে। যাত্রা করেছে এক বৃহৎ সত্যের দিকে। আর শ্রীবিলাস সহনায়ক হয়ে বন্ধুত্বের সূত্রটিকে প্রথম থেকে শেষ অবধি ধরে রেখে কাহিনিতে বন্ধুত্বের রূপরেখা নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় জন্মের পর থেকেই শচীশের উপরে সবথেকে বেশি প্রভাব তার জ্যাঠামশাই জগমোহনের। জগমোহন ছিল শিক্ষিত এবং নাস্তিক মানুষ। শচীশও জীবনের প্রথম দিকে তার জ্যাঠামশায় জগমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত এক নাস্তিক। তখনও শ্রীবিলাস শচীশের কাছাকাছি আসেনি। কলেজ জীবন থেকে শচীশের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সূত্রপাত। শচীশের জ্বলন্ত চোখ, গায়ের রং এবং তার অন্তরাত্মাকে দেখে শ্রীবিলাস তাকে সহজেই ভালোবেসে ফেলে–

> "শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক- তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙ্গুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখতে পাইলাম; তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।"[১]

নাস্তিক এবং সোনার বেনে পরিবারের জেনেও শেষ পর্যন্ত শচীশের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হল শ্রীবিলাসের। কাহিনিতে দেখা গেছে এই নাস্তিকতাকে কেন্দ্র করে শ্রীবিলাসকে বন্ধু শচীশের পক্ষ নিয়ে অনেকের সঙ্গে ঝগড়া করতে। তারপর একসময় জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু হয়েছে অর্থাৎ শচীশের যে পারিবারিক আশ্রয়, তার বিনাশ ঘটেছে। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু শচীশকে ভীষণভাবে বেদনাহত করে। শচীশ হঠাৎ করে দুই বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায়–

> "এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায়, জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।"[২]

শ্রীবিলাস বন্ধুর অনেক খোঁজ খবর করেও কোনো সন্ধান পাননি। একসময় শ্রীবিলাস খোঁজ পেল যে তার সেই নাস্তিক বন্ধু শচীশ লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মেতে উঠেছে। এরপর থেকেই শচীশ ও শ্রীবিলাসের বন্ধুত্বটি কাহিনিতে পূর্ণমাত্রায় গতিশীল হয়েছে। নাস্তিক শচীশ আস্তিক হওয়ার সাথে সাথে যেভাবে শচীশ লীলানন্দ স্বামীর সেবা করেছে তাতে শ্রীবিলাস আঘাত পেয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসও বন্ধু শচীশের সংসর্গে থাকার জন্য তাদের সাথে যুক্ত হয়ে লীলানন্দ স্বামীর ভক্ত হয়ে তার সেবা করেছে-

> "শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না; শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।"[৩]

এখানেই বন্ধুত্বের এক চরম পর্যায়ের চিত্র আমরা দেখতে পাই। শুধুমাত্র বন্ধু শচীশের সংসর্গে থাকার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করে শ্রীবিলাস লীলানন্দ স্বামীর ভক্ত হয়েছে, তার সেবা করেছে।

এরপর উপন্যাসে দুই বন্ধু এবং তার মাঝে এক নারী অর্থাৎ দামিনীর আবির্ভাব হয়েছে। এই নিয়ে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। লীলানন্দ স্বামীর দলে শচীশ এবং শ্রীবিলাসের বন্ধুত্ব পুনরায় জোড়া লেগেছে। শ্রীবিলাস বন্ধুর নাস্তিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। এরপর দুই বন্ধু মিলে রসের সাধনায় মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই রস সাধনাও তাদের বেশিদিন সুখ দিতে পারে না। এই সাধনার মধ্যে দামিনীর আবির্ভাব তাদের চিত্তে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বিধবা দামিনী শচীশের প্রতি আকর্ষিত হয় কিন্তু শচীশ তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে-

> "শচীশ কেবল শোভাই দেখিল দামিনীকে দেখিল না।"[৪]

অন্যদিকে শচীশ এবং দামিনীর অভিমানের মাঝে এসে দাঁড়ালো শ্রীবিলাস। দামিনী একের পর এক দাবি রাখতে শুরু করল শ্রীবিলাসের কাছে। কখনও বেজিকে দুধ খাইয়ে দেওয়া, কখনো বই এনে দেওয়া ইত্যাদি। ধীরে ধীরে কখন শ্রীবিলাস শচীশ এবং লীলানন্দ স্বামীর থেকে দূরে সরে গিয়ে দামিনীর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সে বুঝতেই পারেনি। শচীশও এই কারণে তার বন্ধুকে তীব্রভাবে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করেনি বা দামিনীর সঙ্গে সহজ মেলামেশায় তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। তাই শ্রীবিলাসকে একজায়গায় বলতে দেখা যায়- "আমার দামিনী।"[৫]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শচীশের অনুরোধে দামিনী যখন আবার তাদের সাথে সাধনায় যোগ দিয়েছে তখন শ্রীবিলাসের নিজেকে সঙ্গীহীন মনে হয়েছে-

> "আমি বেকার ও সঙ্গীহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজীর দরবারে পূর্বের মতো ভর্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথাবার্তা গানবাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।"[৬]

অর্থাৎ দামিনীর আকর্ষণ ছিল শচীশের প্রতি। অন্যদিকে শ্রীবিলাসের আকর্ষণ ছিল ছিল দামিনীর প্রতি। তাই দামিনী শচীশের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করলে শ্রীবিলাশের ঈর্ষা হয়েছে-

> "শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাব কেন!"[৭]

তবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে বড়সড় বিরোধের জন্ম নেয়নি কখনও। বরং ঘটনাক্রমে শচীশ দামিনীকে তার থেকে দূরে যেতে বললে শ্রীবিলাস আবার দামিনীর সঙ্গ পেয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে-

> "যদি আমার মত মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে"[৮]

তাই সবশেষে দেখা গেছে শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এটাও দেখা গেল বন্ধুত্বের টানে এই বিয়ের পূর্বে শ্রীবিলাস শচীশকে কলকাতায় এনেছে তাদের বিয়ে সম্প্রদান করার জন্য এবং শচীশও তার বাড়িটা ভোগ করার জন্য দিয়ে দেয় শ্রীবিলাস ও দামিনীকে।

অর্থাৎ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসের সঙ্গে শচীশের বন্ধুত্ব কিন্তু বজায় থেকে যায়। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কাহিনি এই বিষয়ের উপর গড়ে উঠেছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই উপন্যাসের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্কের তীব্রতা তেমন কোথায়? এক বন্ধুর উপর এক বন্ধুর পারস্পরিক প্রভাবও বা তেমন কোথায়? 'গোরা' বা 'চোখের বালি'তে যে বন্ধুত্ব দেখা গেছে, সেই রকম বন্ধুত্ব তো এখানে দেখা যাচ্ছে না। শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাসের কলেজে পরিচয় হয়েছে, বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, তারপর একে অপরের সঙ্গী হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দামিনীকে নিয়ে তাদের কিছুটা টানাপোড়েন এবং তারপরে শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ। এই কাহিনির মধ্যে বন্ধু সম্পর্কের প্রবাহ থাকলেও, বন্ধুত্বের প্রভাব তেমন কোথায়? কিন্তু ভালোভাবে যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে এখানে বন্ধুত্বের প্রভাব হয়ত অত তীব্র নয়, তবুও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার সচল উপস্থিতি ঘটেছে। এখানেই এই উপন্যাসটির বন্ধুত্বের সম্পর্কটি অন্য উপন্যাসের বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলির থেকে আলাদা। শচীশ ও শ্রীবিলাস পরস্পর বন্ধু। উপন্যাসের কাহিনি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তাদের সম্পর্কের বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রভাবকে ততখানি তুলে ধরেননি, সম্পর্কেই জিইয়ে রেখেছেন। বাস্তব জীবনে কোনো সম্পর্কে অনেক সময় যে পারস্পরিক প্রভাবের চেয়ে আকর্ষণ মুখ্য

হয়ে দেখা দেয়। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শচীশ-শ্রীবিলাস সম্পর্কে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাহিনিতে শচীশ-শ্রীবিলাস সম্পর্কে পারস্পরিক প্রভাব বা কার্যকারিতা কম, কিন্তু আকর্ষণ আছে। শ্রীবিলাসের দিক দিয়ে যা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবিলাস শচীশের দৈহিক আকর্ষণে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। মাঝে সাময়িক যোগাযোগ ছিন্ন হলেও পরে আবার বন্ধুর আকর্ষণেই লীলানন্দ স্বামীর দলে যোগদান করেছে। তারপরে আর উভয়ের সম্পর্কে যোগাযোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। কাহিনির শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুত্বের আকর্ষণ বা বন্ধু সংসর্গকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বন্ধুত্ব করতে করতে দুই বন্ধু তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সফল হয়েছে। শচীশ যাত্রা করেছে সীমা থেকে অসীমের দিকে। আর শ্রীবিলাসও লাভ করেছে তার কাঙ্ক্ষিত দামিনীকে। কাহিনিতে দামিনীকে নিয়ে শচীশ এবং শ্রীবিলাসের সম্পর্কে সংঘাতের একটি অবকাশ অবশ্য ছিল। তবে এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ একটু ভিন্নপথে হেঁটেছেন। কাহিনিতে শচীশের প্রতি দামিনীর অনুরাগ ছিল, অন্যদিকে শচীশের মধ্যে সামান্য হলেও ছিল দামিনী প্রীতি। শ্রীবিলাসও মনে মনে দামিনীকে ভালোবেসে ফেলে। এছাড়া শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাসের মতবিরোধও আছে। গোরার মত রবীন্দ্রনাথ শচীশকে তার্কিক রূপে তৈরি করেছেন। সুতরাং দুই বন্ধুর মতের মিল বা ভাবনাগত একতা না থাকায় এবং পাশাপাশি দুই বন্ধু মিলে একই মেয়ের উপর অনুরক্ত হওয়ায়, বন্ধুত্বে ঘনিয়ে আসতে পারত সংকট। কিন্তু তা হয়নি। এই রকম ভাব দিয়েই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বন্ধুত্ব তৈরি। তাই বৃহৎ কোনো প্রভাব না থাকলেও বন্ধুত্বের আকর্ষণ এখানে মুখ্য হওয়ায় শ্রীবিলাস এবং শচীশের সম্পর্কের মধ্যে দামিনী বড় সংকট সৃষ্টি করতে পারেনি। হৃদয়ের গভীরতা বা আকর্ষণের প্রবাহে পারস্পরিক বন্ধুত্বের যোগসূত্রটি উপন্যাসে চিত্রিত। তবে শ্রীবিলাস ও শচীশের সম্পর্কে পারস্পরিক একটা পরোক্ষ প্রভাব যেন লক্ষ্য করা যায়। শচীশ দামিনীকে ত্যাগ করে শ্রীবিলাসের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি তৈরি করে বৃহৎ সত্যকে উপলব্ধি করেছে। যাত্রা করতে পেরেছে সীমা থেকে অসীমের দিকে। এই বন্ধু প্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কৌশলে চিত্রায়িত করেছেন। শচীশ কিন্তু শ্রীবিলাস বা দামিনী কাউকেও বলছে না পরস্পরকে বিয়ে করতে। শুধু বুঝতে পেরে পটভূমি তৈরি করে দিচ্ছে। আবার শ্রীবিলাস যখন দামিনীকে বিয়ে করার সংকল্প করে, তখন শচীশকে দেখা যায় আনন্দে ভেসে যেতে। শচীশ ও শ্রীবিলাস সম্পর্কের এই গভীরতা 'চতুরঙ্গে'র বন্ধুত্বের প্রধান বিশেষত্ব। এবং শেষে দেখা যায় এই সম্পর্কটিই কাহিনিতে একমাত্র স্থায়ী হয়েছে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশ অপেক্ষা শ্রীবিলাসকেই বন্ধুরূপে কাহিনিতে সক্রিয় বলে মনে হবে এবং পাশাপাশি শ্রীবিলাসের মধ্যে হৃদয়ের গভীরতাও বেশি দেখা গেছে। শ্রীবিলাস কিছু না ভেবে শুধু বন্ধুত্বের টানেই শচীশের সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছে। মানুষ যে কখনও কখনও অর্থ, ধন-দৌলত বা প্রতিপত্তি এই সব অপেক্ষা বন্ধন বা সম্পর্ককে বেশি প্রাধান্য দেয়, শ্রীবিলাস তার প্রমাণ। সে সব কিছু ত্যাগ করে শচীশের সঙ্গ দিয়েছে। আর লেখক এক্ষেত্রে উপন্যাসে অবলম্বন রূপে নিয়েছেন বন্ধুত্ব সম্পর্ককে। তাই বলে শ্রীবিলাস বন্ধু রূপে একেবারে পুরোপুরি আদর্শ বা ত্রুটিশূন্য নয়। দামিনীর আবির্ভাবে শ্রীবিলাসের মনে শচীশের প্রতি এক ঈর্ষার জন্ম দেয়। এতে মনে হতে পারে শ্রীবিলাস কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর। তবে এই সামান্য ঈর্ষাভাব প্রদর্শনে শ্রীবিলাস চরিত্রকে স্বার্থপর বা ঈর্ষাতাড়িত চরিত্র বলা যাবে না। সে জীবনে অনেক কিছু করতে পারত, শুধু বন্ধু সংসর্গের আকুলতার কারণে তা করেনি। সে যখন দেখছে শচীশকে দামিনী ভালোবাসলেও শচীশ সেই ভালোবাসার কোনো দাম দিচ্ছে না, অথচ দামিনী তার ভালোবাসাকে বুঝতে পারছে না বা চাইছে না, তখনই সে শচীশের প্রতি ঈর্ষাভাব পোষণ করেছে, অন্য কোনোভাবে করেনি। তাই সামান্য একটু ঈর্ষাভাবেই শ্রীবিলাসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না। সর্বোপরি এটি কাহিনিতে শেষ পর্যন্ত স্থায়ীও হয়নি। তবু সাময়িক ঈর্ষাভাব প্রদর্শনে শ্রীবিলাস চরিত্রে একটা প্রশ্নচিহ্ন এসেই যায়। 'চতুরঙ্গে' দামিনীর প্রতি শ্রীবিলাসের আকর্ষণ বা শচীশের প্রতি দামিনীর আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করা গেছে। তবে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি বলা যায় না। শ্রীবিলাস দামিনীকে লাভ করেছে, কিন্তু সেখানে কোনো জোর প্রতিষ্ঠা বা ছিনিয়ে নেবার দৃষ্টান্ত নেই। শচীশ যখন দামিনীর প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছে, তখনই ছিন্ন দামিনীকে জীবনে স্থিরতা দেওয়ার জন্য শ্রীবিলাস তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে, বলপূর্বক বা জোর করে নয়। শচীশ এই উপন্যাসের নায়ক, আর শ্রীবিলাস সহনায়ক। রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বন্ধুত্ব চালনার ভার দিয়েছেন সহনায়ক শ্রীবিলাসের উপর। শচীশ দামিনীকে ত্যাগ করে সীমা থেকে অসীমের পথে যাত্রা করেছে। তার পরেই দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের পরিণয়ের পটভূমি তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে শ্রীবিলাস চরিত্রের স্বার্থপরতার কোনো গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং শচীশ বা শ্রীবিলাস, কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে পারছে না বা ছাড়ার চেষ্টা করছে না। উপন্যাসে এটাই উভয়ের বন্ধুসত্তার বিশেষত্ব।

কাহিনির শেষেও রবীন্দ্রনাথ শ্রীবিলাসের জীবন থেকে দামিনীকে অকস্মাৎ সরিয়ে নিয়ে শ্রীবিলাসকে একা করে দিয়েছেন। তাই শেষ পর্যন্ত লক্ষ করা যায় শ্রীবিলাসের পারিবারিক জীবনের কোনো বন্ধন নেই। শচীশের যা ছিল, সবই শেষ হয়ে গেছে। দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের যাও বা একটি সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তাকেও লেখক নষ্ট করে দেন। একমাত্র বন্ধুত্বকেই তিনি উপসংহারে স্থায়িত্ব দিয়েছেন। শচীশ এবং শ্রীবিলাসের জীবনে শুধু একটি সম্পর্কের অস্তিত্বকেই উপন্যাসের শেষ অব্দি জিইয়ে রেখেছেন, সেটা হল বন্ধুত্ব।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চতুরঙ্গ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩২২, কলকাতা, পৃ. ১।
২। তদেব, পৃ. ৩৩।
৩। তদেব, পৃ. ৪০।
৪। তদেব, পৃ. ৪৮।
৫। তদেব, পৃ. ৮৪।
৬। তদেব, পৃ. ৭৮।
৭। তদেব, পৃ. ৯৪।
৮। তদেব, পৃ. ১০৪।